ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 17. Number 01. May 2022

ভারত ও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক: ২০০৯-২০১৮ সময়কালের একটি বিশ্লেষণ

তমা রানী মিস্ত্রী*

Abstract: Two things are very important in relationship among the countries. One is the internal affairs of the countries, the other is the response of the countries to the global issues. Although Bangladesh is trying to maintain friendly relations with almost every country in the world, Bangladesh's relationship with some countries are more important than others. Bangladesh's relationship with India and China is very significant. In the case of Bangladesh-India relations, the internal affairs greatly influence their inter-state relations. On the other hand, Bangladesh has pursued a policy of economic closeness with China. In the circumstance of hostile relations between India and China, Bangladesh is maintaining a balanced relationship with both countries. Due to space limitations of this research work, for the convenience of discussion, this paper has revolved around the analysis of whether the 'regime character' of Awami League-led Grand Alliance Government (2009-2018) has affected the relations of Bangladesh with India and China and to what extent.

মূলশব্দ: ভারত, চীন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দক্ষিণ এশিয়া একটি গুরুত্বপূর্ন অঞ্চল। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির হেজেমনিক রাষ্ট্রসমূহের কাছে এই অঞ্চল বিশেষ তাৎপর্য বহন করে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় 'Centrality of India' বা ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক থেকে এ অঞ্চলের কেন্দ্রে ভারতের অবস্থান ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ন করে তুলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশও তার অবস্থানগত কারনে ভূ-রাজনৈতিকভাবে ক্রমশঃই গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে। ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশ মূলতঃ ভারত বেষ্টিত একটি দেশ। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশ বৃহত্তর ভারতের একটি অংশ ছিলো ফলে, কেবল এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নয়, এদেশের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভারত নামক Phenomenon টি ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে (Ahmed: 2008)।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে ভারত বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে আসছে। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তাজনিত ইস্যু, তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব বিদ্যমান। এমনকি, ভারতের

* গবেষণা সহকারী, সেন্টার ফর এশিয়ান স্টাডিজ, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার স্বার্থের সাথে জড়িত যেকোনো নীতি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় এদেশে যখনই সরকার পরিবর্তন হক না কেন প্রায় প্রতিটি সরকারই ভারতকে কম-বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে (Rashid: 2005)। এক সময় বলা হতো, বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে তা নির্ভর করবে কোন দল কত বেশি ভারতের স্বার্থের অনুকূলে থাকবে। এ বিষয়টি অবশ্য ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকারি দলের পরিবর্তনের উপরও বহুলাংশে নির্ভর করে। অর্থাৎ, ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। ভারত ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে (Karim: 2006)। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ৯/১১ এর ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নীতির অন্যতম সমর্থক রাষ্ট্র ভারত। ফলে, ভারতের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' অংশগ্রহণ, বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে প্রায় অবধারিত করে তুলে।

অন্যদিকে, ভৌগোলিকভাবে চীন দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত না হলেও অর্থনৈতিকভাবে চীন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। বর্তমান সময়ে বলা হয়ে থাকে, 'China is not part of South Asia, but China is in South Asia'. দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের 'পুবে তাকাও' নীতির মধ্য দিয়েই এর সত্যতার প্রমান পাওয়া যায়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারনে বাংলাদেশের পক্ষে কখনই ভারতকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের অবস্থান বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। বহুল প্রচলিত 'দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আগ্রাসন' নীতির বিপরীতে চীন এ অঞ্চলে ভারতের প্রতিবেশি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের কাছে ভারতের ক্ষমতার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে (Aneja: 2006)। ভারতের প্রতিবেশি দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের নীতির বিপরীতে চীনের কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি, ভারতের আগ্রাসন নীতির বিপরীতে চীনের বিপুল অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের নীতির ফলে, নেপাল, শ্রীলংকার মতো বাংলাদেশেও চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ককে জোরদার করণের প্রয়াসে লিপ্ত। ভারতের নরেন্দ্র মোদীর সরকারের 'প্রতিবেশি প্রথম নীতি' দক্ষিণ এশিয়ায় চীন-ভারতের প্রতিযোগিতাকে আরো গতিশীল করে তুলেছে (Hussain: 2005)। ২০১৫ সালে চীন ভারতকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী দেশ হিসাবে এদেশে নিজের অবস্থান আরো পাকাপোক্ত করে তুলেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ভারত-বিরোধী দল বা ভারতের ব্যাপারে সন্দেহবাদী দল। আর বিপরীতে আওয়ামী লীগ হলো ভারত-বান্ধব দল। অতএব, ২০০৯-২০১৮ সময়কালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বধীন মহাজোট সরকারের শাসনামলে ভারত ও চীনের প্রতি বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি কেমন ছিল সেটা বুঝতে চেষ্টা করা এই প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য। এছাড়াও এখানে বোঝার চেষ্টা করা হবে, আওয়ামী লীগ সরকারের 'রেজিম-চরিত্র' বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে, বিশেষ করে বাংলাদেশের ভারত-চীন বিষয়ক নীতিকে প্রভাবিত করে কিনা, করলে কতটুকু করে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি গুনবাচক (qualitative) পদ্ধতিতে করা হয়েছে। এই গবেষণায় একটি নির্দিষ্ট সময়সীমাকে ধরে কাজ করা হয়েছে। যেহেতু, বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রভাবক সংখ্যা অনেক বেশি ও এগুলোর প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল, সেহেতু, এ ধরণের জটিল প্রভাবকসমূহের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করার জন্য গুনবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করাই শ্রেয়। ফলে, এখানে সংখ্যাবাচক জটিল পদ্ধতি যেমন, রিগ্রেশন বা ক্রস টেবুলেশন ব্যবহার করা হয়নি। এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক, ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণাত্নক এ্যাপ্রোচ (Descriptive, Interpretive and Analytical Approach) অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে আর্টিকেল, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের বিশ্লেষণ পাঠ করে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এই গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়েছে। গবেষকদের প্রবন্ধগুলো বেশিরভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগদ্বয়ের সেমিনার লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, 'Center For Asian Studies' (CAS) এর সংগ্রহশালা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত ও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক: ২০০৯-২০১৮ সময়কাল

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কঃ ২০০৯-২০১৮

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ভারতের কংগ্রেস দলের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ও দৃঢ়তার ফলে বাংলাদেশ যে সাহায্য-সহযোগীতা লাভ করে, ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় প্রদান, আওয়ামী লীগ-কংগ্রেস উভয় দলের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শগত নৈকট্য বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মীয় রাজনীতিকে নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতির ফলে বলা যায়, আওয়ামী লীগ ও ভারতের কংগ্রেসের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও আদর্শগত কারনে শাসনব্যবস্থাগত নৈকট্য বা সাদৃশ্য (regime affinity) রয়েছে। ফলে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তা, আওয়ামী লীগ ও ভারতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক, আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ে ভারতের প্রতি সফট বা নরম মনোভাব ভারতের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করাকে নিশ্চিত করে (Dixit: 2003)।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে জরুরী অবস্থায় সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত জাতীয় নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠিত হয়। যেহেতু, বাংলাদেশ প্রায় দুই বছর (২০০৭-২০০৮) একটি অনির্বাচিত ও সেনা-সমর্থিত অগনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মধ্যে ছিল, সেহেতু দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নতুনত্ব আসাটা স্বাভাবিক ছিল। একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে বিপুল আসনে জয়ী হয়ে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ শুরু করেন (Mohammad: 2010)। সময়ের পরিক্রমায়, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে ভারতকে যতটা গুরুত্ব দিক না কেন অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ বৈচিত্র আনার বিষয়ে বেশি আগ্রহ পোষণ করে। বর্তমানে

যেকোন (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি) সংকটের সমাধান হিসেবে অর্থনৈতিক সংকট মুক্তিকেই মূল শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের মতো একটি প্রান্তিক রাষ্ট্রের জন্যও অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রধান বিষয়।

বাংলাদেশ-ভারতঃ রাজনৈতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি মূলতঃ ভারত কেন্দ্রিকতা বা ভারতমূখী ও ভারত বিরোধীতা বা ভারত থেকে দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কিন্তু, ২০০৯-২০১৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের বৈদেশিক নীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করলে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। উক্ত অভিনন্দন জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে মূলতঃ ২০০৯ সালের নির্বাচনের পর মহাজোট সরকারের বৈদেশিক নীতিতে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের নতুন মোড় নেয়া শুরু হয়। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রনব মুখার্জী নতুন সরকারের প্রতি সন্ত্রাস দমন ও সন্ত্রাসের উৎস খোঁজার আহ্বান জানালে শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দেন যে, 'আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের মাটি কখনই ব্যবহার করতে পারবেনা' (Khan: 2009)। এতে করে বাংলাদেশের কাছে ভারতের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর এবং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফর বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের মধ্যে নতুন আশার দ্বার উন্মোচন করে। উক্ত সফরকালে দু'দেশের মধ্যে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি উন্নয়ন সহযোগিতাবিষয়ক কাঠামোগত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অন্যতম বিষয় ছিলো; স্থল সীমান্ত চুক্তি বা Land Border Agreement-LBA। এ চুক্তিতে আরো একটি বিষয় ছিল আর তা হলোঃ এ পরিকল্পনা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স অফ ইন্ডিয়া-বিএসএফ এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবির মধ্যে সীমান্ত পাচার, পণ্য চোরাচালান, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রভৃতি সমস্যায় সীমান্তের শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (The Hindu: 2011)। এছাড়াও, উক্ত সফরকালে বাংলাদেশ-নেপাল ওভারল্যান্ড ট্রানজিট ট্র্যাফিক সুবিধাদান বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তীতে এর বাস্তবায়ন হয়নি।

২০১৪ সালে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পরেও বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক বিরাজমান থাকে। ২০১৫ সালের ৬ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরকালে দু'দেশের মধ্যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও চুক্তি হয়। এ সফরকালে কিছু ঐতিহাসিক দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধান ও সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ন চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা হয়েছে। সেগুলো হলঃ

ক) ভারত-বাংলাদেশ মধ্যকার স্থল সীমান্ত চুক্তি (Land Boundary Agreement-LBA)

খ) ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পণ্য সরবরাহের জন্য ট্রানজিট ও ট্রানশীপমেন্ট সুবিধা প্রদান

গ) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ এর হাতে বাংলাদেশি হত্যা বন্ধের বিষয়

ঘ) টিপাইমূখ বাঁধ নির্মান ও তিস্তা পানি বন্টনজনিত সমস্যা

ঙ) রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মান, ইত্যাদি।

এটা যুক্তিসংগতভাবে বিবেচ্য যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে ভারতকেন্দ্রিকতা আনয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। মূলতঃ শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আদর্শগত অবস্থানের কারনে ভারতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে (Masud: 2016)।

২০০৯-২০১৮ সময়কালে ভারতের দুটি ভিন্ন সরকার ব্যবস্থায় রেজিম চরিত্রে যে পরিবর্তন আসে তাতে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের রেজিম চরিত্রও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বধীন সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, ২০১৪ সালে ভারতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকে ভারতের প্রতি শেখ হাসিনার সরকার 'সতর্ক ঘনিষ্টতা'র সম্পর্কে রূপ নেয়। ২০১৭ সালের আগ পর্যন্ত শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আচরণে বা কার্যকলাপে সেটার তেমন একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তবে, ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরকালে ভারতের কাছ থেকে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য ভারতের সমর্থন প্রত্যাশা করলে বিজেপি সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদর্শন করে যা আওয়ামী লীগ ও বিজেপির সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদাসীনতাকে ইঙ্গিত করে (যুগান্তরঃ ২০১৮)। এছাড়াও, ভারতের 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা Citizenship (Amendment) Act-CAA', 'জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা National Register of Citizens-NRC', আসাম ইস্যু, সীমান্ত হত্যা, বাংলাদেশী মুসলমানদের নিয়ে অমিত শাহ্‌সহ বিজেপির নেতাদের কটূক্তি, তিস্তার পানিবন্টন সংক্রান্ত ইস্যু ইত্যাদি নিয়ে ভারতের সাথে শেখ হাসিনা 'সতর্ক ঘনিষ্টতার' নীতি অনুসরন করতে থাকেন বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির সাথে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সম্পর্ক উষ্ণ হচ্ছে এমন তথ্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার হতে থাকে। মেইনস্ট্রীম উইকলি থেকে প্রকাশিত "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশঃ হোয়াট ইফ বিএনপি রিটার্নস" শিরোনামে একটি নিবন্ধে 'ভারত-বিএনপি সম্পর্কে পরিবর্তনের হাওয়া?' এমন প্রশ্ন করা হয়। এছাড়াও, ভারতের দৈনিক 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বিএনপির নেতারা ভারতের কাছে সাহায্য চাইছেন বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে (যুগান্তরঃ ২০১৮)।

ঐতিহাসিকভাবে, জিয়ার শাসনামলে বিজেপির পূর্বসুরী ভারতীয় জনসংঘে অংশগ্রহণকারী জনতা পার্টির সরকারের সাথে বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শগতভাবে পশ্চিমা তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঘেঁষা রাজনীতির প্রবনতা ও ধর্মীয় রাজনীতির প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে নৈকট্য বিদ্যমান ছিল এবং ২০০১-২০০৬ সময়কালে ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৪ সালে কংগ্রেস ভারতে সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত বিজেপির সাথে বিএনপির উষ্ণ সম্পর্ক বজায় থাকা (তবে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় ও অস্ত্র চোলাচালান, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে পাকিস্তানের উষ্ণ সম্পর্ক ছাড়া) বাংলাদেশে বিএনপির শাসনামলে চীনের অধিক তৎপরতা বিদ্যমান থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে ভারতের সন্দেহ বৃদ্ধির ফলে ভারতের কাছে

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি অসন্তোষ ইত্যাদি বিষয় আওয়ামী লীগের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। তথাপি, ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল, ভারত তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর উপর অভিভাবকসুলভ আচরণ করে। তার এই হেজেমনিক মনোভাব ও আচরণ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ছোট রাষ্ট্রগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে দূর্বল করে দিচ্ছে।

২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর রাখাইন প্রদেশের সীমান্ত পুলিশ অফিসারদের উপর রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা আক্রমন চালায়, এতে ৯ জন অফিসার মারা যায়। এরই প্রেক্ষিতে, রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে মিয়ানমার সেনাবাহিনী 'Clearance Operation' নামক অভিযান চালালে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ২৩ শে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় সাত লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। কিন্তু, রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান নেয় (Dussich: 2018)। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশের বিভিন্ন শাসনামলের সরকার বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের বাংলাদেশের যেকোন সংকটময় অবস্থায় ভারতকে পাশে পাবার মোহচ্ছেদ ঘটে। যেহেতু, ভারত মিয়ানমারের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং অনেক রোহিঙ্গা ভারতেও আশ্রয় নিয়েছিল এবং ভারত তাদেরকে সফলতার সাথে প্রত্যাবর্তনে সফল হয়েছে সেহেতু, বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন ইস্যুতে ভারতের সমর্থন লাভ বাংলাদেশের জন্য অত্যাবশ্যক হিসেবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করে। যদিও, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের সাময়িক আবাসনের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করেছে তথাপি, রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন বিষয়ে ভারতের উদাসীমতা এবং মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর নির্মমতাকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ইস্যু বলে এড়িয়ে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের পক্ষে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ-ভারতঃ সীমান্ত ও ছিটমহল

বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র তথা ভারতের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা এবং দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধান ছিল এ সরকারের বৈদেশিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। ভারতের দাবি ছিল যে, এই সব আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলো যেমন, উলফা, জিএনএলএ সহ ২০ টি গ্রুপ বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে অবস্থান করছে। এরই প্রেক্ষিতে, ২০১৫ সালের ১৬ নভেম্বর ঢাকায় দু'দেশের মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সহযোগিতা চায় ভারত। পাশাপাশি দু'দেশ সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় যৌথ কার্যক্রমে সম্মত হয় (https://m.banglanews24.com)। পরর্বতিতে, আওয়ামী লীগ সরকারের তৎপরতায় আসামের উলফা বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের নেতা অনুপ চেটিয়া, অরবিন্দ রাজখোয়া, লক্ষ্মী প্রসাদ গোস্বামী, বাবুল শর্মাকে ভারতের কাছে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয় (Weekly Holiday: 2017)। বলা যায় যে, নিরাপত্তার প্রশ্নে বিশেষ করে ভারতের উপরোক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোকে দমনের ক্ষেত্রে ভারত শেখ হাসিনার সরকারের কাছ থেকে যতটা সহযোগিতা পেয়েছে, তাতে ভারত তাদের সন্তোষের কথা প্রকাশ্যেই জানিয়েছে (আহমেদঃ ২০১৭)।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া। দু'দেশের সীমান্ত এরিয়া সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত সমস্যা। বাংলাদেশ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও একের প্রতি অপরের ভীতি ও ভারতের আধিপত্যমূলক নীতির বিষয়ে গভীর সন্দেহ ও অনাস্থা এজন্য অনেকাংশে দায়ী (Bradnock: 2006)। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মোটা দাগে ১৬৮ টি ছিটমহল ছিল। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১ টি বিনিময়যোগ্য ছিটমহল ছিলো এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫৭ টি ছিটমহল ছিল, যার মধ্যে ৫১ টি ছিল বিনিময়যোগ্য (Ahmed: 2006)। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ঐতিহাসিক স্থলসীমা চুক্তি হয়েছিল। সেক্ষেত্রে, ওই চুক্তির পরপরই চুক্তির ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতকে দক্ষিণ বেরুবাড়ি হস্তান্তর করেছিল। কিন্তু চুক্তির বিধান মোতাবেক ভারত তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশকে হস্তান্তর করেনি (Bhardwaj: 2006)। ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সফরকালে দু'দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় বিষয়ক ব্যাপক আলোচনা হলেও তখন সমস্যার কোনরূপ সুরাহা হয়নি। ২০১৩ সালে স্থল সীমান্ত চুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়নে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সরকার ভারতের সংসদের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপন করলে তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপি ও পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধীতায় তা আটকে যায়। পরবর্তিতে, ২০১৫ সালের জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে দু'দেশের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি (Land Boundary Agreement-LBA) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থলসীমা চুক্তিটি ২০১৫ সালের ৫ই মে তারিখ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পায়। এই বিল পাস হওয়ার ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক পুনরায় উচ্চতায় পৌঁছায়, রচিত হয় সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের এক নতুন অধ্যায়। এটা অবশ্যই বিবেচ্য যে, সীমান্তের যে ছিটমহলগুলোর বিনিময় কার্যকর করা হয় সেগুলোর অধিবাসীরা ভারত বা বাংলাদেশের জাতীয়তা উপভোগ করতে পারবে। ৩১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ এর মধ্যে দু'দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় এবং জমির সীমানা নির্ধারণের কাজের অভ্যন্তরীন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দু'দেশের সরকারই ছিটমহলের অধিবাসীদের নিরাপদে অভিবাসনের সকল সুযোগ-সুবিধা ও জাতীয়তা প্রদান করে (Baral: 2016)।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বহুদিনের। এর মধ্যে রয়েছে নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের গুলি করে হত্যা, নির্যাতন এবং অপহরণ। এসব ঘটনা আন্তর্জাতিক চুক্তিরও লঙ্ঘন (বিবিসি বাংলাঃ ২০১৮)। সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে থাকা কিশোরী ফেলানীর মৃতদেহ বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিক হত্যার প্রতীক হয়ে রয়েছে। কাঁটাতারে ঝুলে থাকা ফেলানীর লাশের ছবি দেশবিদেশের মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের সীমান্তরক্ষাকারী বাহিনীর (বিএসএফ) নিষ্ঠুরতা বিশ্ব বিবেককে আন্দোলিত করে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তকে 'মৃত্যুর দেয়াল' ও 'দক্ষিণ এশিয়ার বার্লিন প্রাচীর' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভারতের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ঢাকা সফরকালে ঘোষনা করেন 'বিএসএফ এখন থেকে নিরস্ত্র মানুষকে কোনো অবস্থায়ই হত্যা করবে না'। কিন্তু চিদাম্বরমের ঘোষনা বাস্তবায়ন হয়নি (ইসলামঃ ২০১৮)।

বাংলাদেশ-ভারতঃ পানি বন্টন ও সমুদ্র সীমানা

যদিও দুই প্রতিবেশি রাষ্ট্রে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদীর হিস্যা নিয়া সমস্যা আছে, তবে, পানি বন্টনজনিত আলোচনার মূল ফোকাস হল ভারত। নদীর পানি বন্টন ও পানিবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মান নিয়ে আলোচনায় দু'দেশের মধ্যে 'Zero Sum Game' এর মত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। পানি বন্টনজনিত বিরোধ মিমাংসার জন্য বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আসছে। দীর্ঘ দিনের আলোচনার পর ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর পানিবন্টন বিষয়ক একটি মধ্য মেয়াদী (৩০ বছর মেয়াদী) চুক্তি সম্পন্ন হয় (Pandey: 2011)। দীর্ঘদিন পর ২০১০ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে তিস্তার পানি বন্টন চুক্তির খসড়া তৈরি করা হয়। ২০১১ সালে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি ছিলো মূল আলোচনার বিষয়। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বিরোধীতার ফলে চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়নি। অতঃপর ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরকালে তিস্তার বিষয়টি নতুনভাবে উত্থাপন করলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বাংলাদেশকে তিস্তার পানির জন্য বিকল্প উৎস খুঁজতে বলেন। মমতা ব্যানার্জীর এমন অযথার্থ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় (প্রথম আলোঃ ২০১৭)। এছাড়াও, ১৯৭৮ সালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিসেবে ভারত সরকার ভারতের মনিপুরে বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ এলাকায় বাঁধ নির্মানের প্রস্তাবনা উত্থাপন করে। যেহেতু প্রকল্প অঞ্চলটি বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্ন, তাই, এ নিয়ে দু'দেশের মধ্যে যৌথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল (Banerjee: 1999)। এতদ্বসত্বেও, ২০১১ সালের ২২ অক্টোবর ভারত সরকার এককভাবে মনিপুর রাজ্য সরকারের সাথে বাঁধ নির্মানের ব্যাপারে চুক্তি সই করে। ২০১২ সালে যদিও দু'দেশ যৌথভাবে একটি সাব-কমিটি গঠন করে, ২০১৩ সালে ঢাকা থেকে দিল্লীর কর্মকর্তাদের কাছে বরাক নদীর উপর বাঁধ নির্মানের ফলে বাংলাদেশের উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হলে, পরিবেশগত ক্ষতি এবং আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় বিবেচনা করে পরবর্তীতে দু'দেশের সরকার প্রকল্পটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় (Uddin: 2017)। ফলে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পানিবন্টন ও বাঁধ নির্মানের বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার মূলতঃ ব্যাপক কার্যক্রম চালালেও এখনও সন্তোষজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। মূলতঃ বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের শাসনামলের পরিবর্তনের সাথে সাথে দু'দেশের মধ্যে পানিবন্টনজনিত বিষয়সমূহের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের গতিতে এক ধরনের জোয়ার-ভাটার প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাথে ভারতের সমুদ্রসীমানা বন্টন বিষয়ক দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ককে বেশ জটিল করে রেখেছিলো। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিরোধপূর্ন এলাকার আয়তন ছিলো ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটার। সমস্যা সমাধানের জন্য ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে বাংলাদেশ মামলা করে। পরবর্তিতে ২০১২ সালের ১৪ই মার্চ International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) এবং The permanent Court of Arbitration (PCA) এর রায়ে দু'দেশের মধ্যে সমুদ্র সীমানা বিষয়ক দ্বন্দ্বের অবসান হয় (কামালঃ ২০১৬)। এর ফলে, বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে কৌশলগত সম্পদ (Strategic Asset) লাভে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারতঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

ভারতের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হল অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্ক। ২০০৯-২০১৮ সালের মধ্যে বানিজ্যিক ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে অসংখ্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সরকারের আমলে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প হল রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মান প্রকল্প। এটি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক একটি প্রকল্প। ২০১১ সালের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে দু'দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারঃ ২০১৭)। এই প্রকল্পটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিমি দূরে স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়ায় সুন্দরবন ও এর আশেপাশের জনজীবনে ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাব পড়বে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়। ফলে, সাধারন জনগন এরূপ প্রকল্পের বিরোধিতা করে এবং সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়কে যথাযথভাবে পুনঃপর্যালোচনার দাবি জানাতে থাকে। এই প্রকল্পের বিরোধিতাস্বরূপ তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর কমিটির সদস্যরা ঢাকা-সুন্দরবন পর্যন্ত লং মার্চ করার মধ্য দিয়ে একটি গনসচেতনতা সৃষ্টি করেছিলো। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকেও কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি জীববৈচিত্র সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে পুনঃবিবেচনা করার জন্য আহবান জানানো হয় (তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটিঃ ২০১৬)।

২০০৯ সালের ৯ জানুয়ারি ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রনব মুখার্জীর ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বানিজ্য চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সংরক্ষন (Bilateral Investment promotion and Protection Agreement) বিষয়ক চুক্তি সম্পাদিত হয় (Sabur: 2010)। অন্যদিকে, ২০১০ সালে ভারত বাংলাদেশের রেলওয়ে, যোগাযোগ, অবকাঠামোসহ অন্যান্য উন্নয়নে মোট এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যার মধ্যে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা হিসেবে ও বাকি ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান হিসেবে প্রদান করে (দৈনিক জনকণ্ঠঃ ২০১৫)। ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও একান্ত বৈঠকের পর দু'দেশের মধ্যে ২২ টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত এসব চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ৪০০ কোটি বা ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দানের বিষয়ে চুক্তি হয় (www.bangladesh.gov.bd)।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সবচেয়ে বড় বানিজ্য অংশীদার ও ভারতের পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্যস্থল হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম আমদানি উৎস হল ভারত। ২০১১ সালে ভারত বাংলাদেশকে ভারতে পণ্য রপ্তানীর পূর্ন প্রবেশাধিকার প্রদান করে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে। ২০১৭-১৮ সালে বাংলাদেশ ভারতে প্রায় ২৭৮.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি করে যা ২০১১-১২ সালে ছিলো মাত্র ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (High Commission of India, Dhaka: 2019)। তবুও ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি

সম্প্রসারনের জন্য অনুকূল বাজার প্রাপ্তি বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে, ভারতের বিপরীতে দু'দেশের মধ্যে বানিজ্য ভারসাম্যহীনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ-ভারত বানিজ্য- ২০০৯-২০১৮ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ওপ্তানী	আমদানী	বানিজ্য ভারসাম্য
২০০৯-২০১০	৩০৪.৬২	৩২০২.৭২	-২৮৯৭.৪৮
২০১০-২০১১	৫১২.৫	৪৫৬০.৫১	-৪০৪৭.৫১
২০১১-২০১২	৪৯০.৪২	৪৭৫৮.৮৯	-৪২৬৮.৪৭
২০১২-২০১৩	৫৬৩.৯৬	৪৭৭৬.৯	-৪২১২.৯৪
২০১৩-২০১৪	৪৫৬.৬৩	৬০৩৫.৫১	-৫৫৭৮.৮৮
২০১৪-২০১৫	৫২৭.১৬	৫৮২৮.১	-৫৩০০.৯৪
২০১৫-২০১৬	৬৮৯.৬৩	৫৪৫২.৯	-৪৭৬৩.২৮
২০১৬-২০১৭	৬৭২.৪০	৪৪৮৯.৩০	-৩৮১৬.৯
২০১৭-২০১৮	৮৭৩.২৭	৮৬২০.০০	-৭৭৪৬.৭৩

উৎসঃ Anisul M. Islam: 2019 & High Commission of India, Dhaka: 2019

উপরের তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বানিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু, ব্যাপকভাবে বাণিজ্য ঘাটতির ফলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে (Dastidar: 2006)। 'Centre for Policy Dialogue' এর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মুস্তাফিজুর রহমান ভারত-বাংলাদেশের বানিজ্য সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "Bangladesh has the largest bilateral trade deficit with India, importing goods worth $6 billion through the formal channel and exporting nearly $600 million worth goods" (The Daily Star: 2018)। ভারতের কতিপয় কোম্পানী বাংলাদেশের তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চল যথাঃ মিরসরাই, ভেড়ামারা ও মংলায় ভারত বিনিয়োগ করেছে (High Commission of India, Dhaka: 2019)।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে দু'দেশের সীমান্ত এলাকায় অবৈধ পণ্য বানিজ্য বা চোরাচালান একটি বিশাল স্থান দখল করে আছে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, "২০০২/০৩ সালে ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ পণ্য আমদানির পরিমান ছিলো ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ভারত থেকে মোট বৈধ আমদানির প্রায় ৩০%"। ২০০৯ সালে ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনের বক্তব্য অনুসারে, 'যেখানে বাংলাদেশে ভারতের আনুষ্ঠানিক পণ্য রপ্তানির পরিমান ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে, সেখানে অবৈধ পণ্য রপ্তানিও উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সমমূল্যের হয়ে যাচ্ছে' (Habiba: 2016)।

বাংলাদেশ-ভারতঃ ট্রানজিট ও ট্রান্সশীপমেন্ট

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান নিয়ে দু'দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হয়ে আসছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্য যা 'সেভেন সিস্টারস' হিসেবে খ্যাত, বহুলাংশে 'Bangladesh-locked' হওয়ার কারনে ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে, এসব অঞ্চলে মানুষ ও পণ্য (Three 'M' বা Man, Machine, Materials) পাঠানোর জন্য বা যাতায়াতের জন্য ভারত বাংলাদেশের কাছ

থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ ট্রানজিট তথা সড়কপথ, রেলপথ, নদীপথ ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহার এবং পাওয়ার গ্রিডস, অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক, টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংযোগের সুবিধা চেয়ে আসছিল (Roy: 2013)। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশ তার ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে সড়ক ও রেলপথ ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের জন্য ২০১০ সালের ৩১ মে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে (Dutta: 2010)। এভাবে, বাংলাদেশ ও ভারত পরস্পরকে এক কম্প্রিহেনসিভ কানেকটিভিটি নেটওয়ার্কে জড়িয়ে ফেলেছে। ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ন। ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়া উচিত কিনা সে বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য যতটা না গুরুত্বপূর্ন তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ন হলো এর মধ্য দিকে বাংলাদেশ কতটুকু তার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ হাসিল করতে পারবে। অন্যদিকে, কৌশলগত দিক থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর প্রতি নয়া দিল্লীর সংশ্লিষ্টতা ত্বরান্বিত হওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ন (Murshid: 2011)। অর্থনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ন কারণ ট্রানজিট সুবিধার ফলে ভারতীয় পণ্যের স্মাগলিং এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে যা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত (Das: 2000)। ১৯৯৯ সালে ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয় যে, ভারতীয় পণ্য ট্রানশীপমেন্টের জন্য বাংলাদেশের টেরিটরি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া মূলতঃ ভারতকে করিডর সুবিধা দেয়ার সমতুল্য (Bayes:1999)। এছাড়াও, ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের বিষয়টির সাথে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিষয়টি পর্যবেক্ষন করা জরুরী। কোন কোন বিশেষজ্ঞদের মতে, কৌশলগত কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতকে দেয়া ট্রানজিট ব্যবস্থাকে নিজেও লাভবান হতে পারে।

বাংলাদেশ-ভারতঃ সামরিক সম্পর্ক

ভারতের সাথে প্রতিরক্ষা সমঝোতার বিষয়টি বাংলাদেশের কাছে খুবই স্পর্শকাতর। ২০১৮ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাহফুজুর রহমান ভারত সফরকালে দু'দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় ঋণ বাস্তবায়ন এবং সার্বিক সহযোগিতার বিস্তার ঘটাতে মোট চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই স্মারক অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে ভারত ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়ার চুক্তি হয় (প্রথম আলোঃ ২০১৮)। এর আগে ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরকালে দু'দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে ১৩,৫০০ মার্কিন ডলার দেয়ার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে (ভোরের কাগজঃ ২০১৭)। অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে চীন ও ভারতের সামরিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ একটি হটস্পট হিসেবে আবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত হলেও এটি সার্বক্ষনিক ভারতের শক্তিশালী নৌবাহিনীর নজরদারিতে থাকে। ফলে, বাংলাদেশের দূর্বল নৌবাহিনী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অকার্যকর রয়ে গেছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০১৭ সালে চীন থেকে স্বল্পমূল্যে দুটি সাবমেরিন ক্রয় করে যা ভারতের কাছে কিছুটা অস্থির হিসেবে ঠেকে তথাপি, নয়া দিল্লী বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে সাবমেরিন পরিচালনার প্রশিক্ষন প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করে

(Parvez: 2017)। ভারত তার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ভারত মহাসাগরের অন্যান্য উপকূলবর্তী অঞ্চল যেমন, শ্রীলংকা, মালদ্বীপে রাডার স্টেশন স্থাপন করেছে এবং মিয়ানমার ও বাংলাদেশেও রাডার স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা করছে (Parvez: 2017)। মূলতঃ বঙ্গোপসাগরে প্রভাব বিস্তারের জন্য যেখানে চীন-ভারত প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ তার সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দু'দেশের কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কঃ ২০০৯-২০১৮

বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন দৃষ্টিভঙ্গি হলো, চীন বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উদ্ভবের বিরোধিতা করেছিলো এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার আগ পর্যন্ত চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান না করার বিষয়গুলো। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ মোটেও সহায়তা করেনি বরং ১৯৭১ এর জুন মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নসাৎ করার লক্ষ্যে চীন-পাকিস্তান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অলিখিত সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো (Sharma: 2001; Chowdhury: 1976)। ফলে, স্বভাবতঃই যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য চীনের কাছে যাবার পথ রূদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তৎকালীন তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তিসমূহের কাছ থেকে বাংলাদেশ কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করবে না; এতে এটা মনে হয়েছিল যে কোন অবস্থাতেই হয়তোবা বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের কোন সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না (Sharma: 2001; Baxter: 1984; Franda: 1982)। বিশেষতঃ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে চীনের ভেটো প্রয়োগ চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরো র্নিধারিত করে দেয়। যদিও যুদ্ধ পরবর্তী মুজিব সরকারের শাসনামলে দু'দেশের মধ্যে কিছু বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু হয়েছিল, তথাপি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি (Chakma: 1996)। '৭৫'এর ১৫ই আগস্টের পরপরই চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তখন থেকেই বিভিন্নভাবে চীন-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টার অন্যতম কারণ ছিলো, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অতি ঘনিষ্ঠতার পরিবর্তে মোটামুটি সম্মানজনক ভারসাম্যপূর্ণ সর্ম্পক বজায় রাখা (Chakma: 1996; Chowdhury: 1979)। পরর্বতীতে ক্রমান্বয়ে, বাংলাদেশের প্রতি চীনের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন এবং দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু চীন কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে বিশ্বাসী, সেহেতু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে চীন খুবই আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। কারণ, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক কারনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক বিষয়েই বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে, চীনের অ-হস্তক্ষেপের নীতি (Policy of Non-intervention) বাংলাদেশের জন্য স্বস্তিকর (Kibria: 2005)। এ বিষয়ে প্রফেসর আনোয়ারা বেগম তাঁর 'Sino-South Asian Relationship: Missed Opportunities?' গ্রন্থেও একমত পোষন করে বলেছেন যে, 'China should not try such penetration, that will amount to interference in domestic politics which is against a decleared Chinese policy and this policy has made China trustworthy to small developing countries' (Begum: 2015)।

বাংলাদেশ-চীনঃ রাজনৈতিক সম্পর্ক

একটি স্বাধীন বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রায়ই ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। চীন-পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও কৌশলগত যোগসূত্র এবং চীন-ভারতের মধ্যে সীমান্ত দ্বন্দ্ব পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কেও যে চিত্র তুলে ধরে তাতে করে কিছু ভূরাজনৈতিক ইস্যুকে সমতলে রেখে দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ভারত ও চীনের মত উদীয়মান শক্তিদ্বয়ের দ্বারা স্যান্ডউইচড হিসেবে বিবেচনা করা যায় (Islam: 2020)। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমারে চীনের উপস্থিতি দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের প্রতি অবিশ্বাস বৃদ্ধি ও নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে এ অঞ্চলে চীনের উপস্থিতিকে সাদরে গ্রহণ করা হচ্ছে। মূলতঃ চীন এ অঞ্চলে ভারতের বিপরীতে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিশক্তি। ভারত আশা করে দক্ষিণ এশিয়ায় তার বৈদেশিক সম্পর্কের কৌশলগত চিত্রে বাংলাদেশ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে (Islam: 2020)। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের পূর্ব এশিয়াকেন্দ্রিক 'পুবে তাকাও' নীতিতে সমর্থনের মধ্য দিয়ে এ সরকারের বৈদেশিক নীতিতে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রকৃতি ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদর্শিক কিংবা রাজনৈতিক বিষয়ের চেয়ে অর্থনৈতিক বিষয় বা ব্যবস্থাই এ সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। এক্ষেত্রে কিছু ফ্যাক্টর বাংলাদেশ-চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন কৌশলগত স্তর হিসেবে কাজ করছে যেমন, বাংলাদেশের সাথে চীনের বানিজ্য, বাংলাদেশে চীনের ঋণ বা অনুদান ও বিনিয়োগ, চীনের Belt and Road Initiative-BRI উদ্যোগে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদ, শক্তি সম্পদের সম্ভাবনা, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, সমুদ্র বিষয়ক সহযোগিতা এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনগুলোতে সহযোগিতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (Zaman: 2017)। ভারতের বিজেপি সরকারের সঙ্গে শেখ হাসিনার সরকারের 'সতর্ক ঘনিষ্টতার নীতি'র বিপরীতে চীনের সাথে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ঘনিষ্টতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর উদাহরণ হিসেবে, চীন তার "যেকোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি"র বাইরে গিয়ে শেখ হাসিনার মহাজোটকে ২০১৮ সালের নির্বাচনে সমর্থনস্বরূপ নির্বাচনের পরের দিনই ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ঝ্যাং জু প্রেসিডেন্ট শি চীন পিংয়ের বার্তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাতে যান এবং বঙ্গবন্ধুকে তিনি 'মহান বিশ্বনেতা' হিসেবে উল্লেখ করেন। (রহমানঃ ২০১৯)।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র যেমন, জার্মানি, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন বহুপাক্ষিক সংগঠন যেমন, জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আসিয়ান, ওআইসি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ সাহায্য আশা করেছিল। জাতিসংঘে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে কার্যকরী নির্দেশনার ভিত্তিতে মিয়ানমারে একটি 'safe zone' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয় কিন্তু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের সমালোচনা বা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নেয়া সব ধরনের পদক্ষেপে চীন ও রাশিয়া ভেটো প্রদান করে (Riaz: 2017)। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা স্বত্বেও, ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা নিপীড়ন বিরোধী প্রস্তাব ও রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হলে এবং পশ্চিমা বিশ্ব থেকে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহনের প্রস্তাব আসলে তাতে সক্রিয়ভাবে চীন ও রাশিয়া অসমর্থন জানায় এবং

ধারাবাহিকভাবে ভেটো প্রদান করার ফলে, প্রস্তাব আটকে যায় ও বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারন করে। চীন ও রাশিয়া রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ও সমঝোতার পক্ষেই অবস্থান নেয় (বাংলা ট্রিবিউনঃ ২০১৮)। রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীনের এরূপ মনোভাব বাংলাদেশ এ সমস্যা সমাধানের পথ আরো কঠিন করে তুলে।

বাংলাদেশ-চীনঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক

২০১৪ সালের নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (৬-১১ জুন ২০১৪) চীন সফর বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। উক্ত সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেইজিংয়ে 'China Institute of International Studies' এর একটি সেমিনারে বলেন যে, 'বাংলাদেশ চীনের মূল স্বার্থ ও ভিশনকে (বিশ্বকে উপযুক্ত, শান্তিপূর্ন এবং সহযোগিতাপূর্ন হিসেবে গড়ে তোলা) সমর্থন করে'। তিনি আরো বলেন, 'তাঁর সরকার চীনের সাথে সম্পর্ককে আরো গভীর করতে সদা প্রস্তুত এবং তাঁর সফর চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে' (Begum: 2015)। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনামলে চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে যাবে উপরের উক্তি থেকে এর দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং এর সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকালে প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং বলেন, 'সমুদ্রপথে সিল্করোড প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ন'। তিনি আরো বলেন, 'চীন বাংলাদেশকে 'সিল্করোড ইকোনোমিক বেল্ট' প্রকল্পে অংশগ্রহনের জন্য আহবান জানিয়েছে, এই প্রকল্প একুশ শতকের সমুদ্রভিত্তিক সিল্করোড যা BCIM-EC বা বিসিআইএম-অর্থনৈতিক করিডোর প্রকল্পকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে' (Begum: 2015)। এই সফরকালে চীন বাংলাদেশকে বিভিন্ন খাতে পাঁচটি প্রকল্পে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে 'কৌশলগত' সহযোগিতায় উন্নীত করার জন্য আলাপ-আলোচনা করেন (প্রথম আলোঃ ২০১৬)। ২০১০ সালেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন সফর করেছিলেন যা ছিল এই সরকারের সময়কালে দু'দেশের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন জোরালো করার অন্যতম পদক্ষেপ (প্রথম আলোঃ ২০১৬)। অন্যদিকে, ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফর দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করে তোলে। এই সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে দু'দেশের মধ্যে ২৬ টি বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (কল্লোলঃ ২০১৬)। এখানে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান কৌশলগত অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু চূড়ান্ত নির্ণায়ক ধরা হয়েছে। সেগুলো হলোঃ

প্রথমতঃ চীনের BRI উদ্যোগে বাংলাদেশের যোগদান উপ-আঞ্চলিক কৌশলগত পরিবেশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। চীনের এই প্রকল্পে কেবল বাংলাদেশই নয়, ভারত ও ভুটান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার সকল রাষ্ট্রই যোগদান করেছে।

দ্বিতীয়তঃ চীনের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ও বিনিয়োগ। চীন বাংলাদেশকে ২৪.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে (Zaman: 2017)।

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চীন পিং ঢাকা সফরকালে ঘোষণা দেন যে, 'বাংলাদেশ-চীন কৌশলগত সম্পর্ক বর্তমানে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কে পরিনত হয়েছে' (Islam: 2020)। মূলতঃ বেইজিংয়ের মূল আগ্রহের বিষয় হল তার পণ্য উৎপাদনের জন্য এমন একটি স্থান যেখানে

সস্তা শ্রম ও নিরাপত্তার জন্য সরকারি সহায়তা পাওয়া যাবে। চীনের 'বিশ্বায়নের পথে ধাবিত হও' (Go Global) নীতি অনুযায়ী 'বেল্ট এন্ড রোড' (BRI) উদ্যোগের আওতাভুক্ত অঞ্চলগুলোকে সামনে রেখে চীনা উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। সস্তা শ্রমের বিপুল সম্ভাবনার ফলে চীন বাংলাদেশে একটি উলম্ব (vertical) অর্থনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করায় অসংখ্য সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা Foreign Direct Investment-FDI এর দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এশিয়া ও আফ্রিকায় পশ্চিমাদের চেয়েও চীন বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন উৎস। চীন কয়েক বছর ধরে অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। 'United Nations Conference on Trade and Development' (UNCTAD) এর রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এসেছে যার পরিমান ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে এবং চীন একাই ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে যা মোট বিনিয়োগের এক-তৃতীয়াংশ। সে হিসেবে বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে প্রায় ৭৭৪ একর জমিতে চীনের 'Exclusive Special Economic Zone' প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে (Islam: 2020)।

চীনের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়। বাংলাদেশ-চীনের অর্থনৈতিক সম্পর্কের অধীনে মূলতঃ প্রায় সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত এবং এর প্রকৃতি বহুমূখী অর্থনৈতিক সংযোগের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। যদিও চীনের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বানিজ্য, বিনিয়োগ, অনুদান, উন্নয়নমূলক সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, তথাপি, দু'দেশের মধ্যে বানিজ্যিক সম্পর্কই মূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে। দু'দেশের মধ্যে বানিজ্যের প্রসারতার প্রমান হিসেবে আমরা নিচের সারণীতে আমদানি-রপ্তানির প্রবাহ পর্যবেক্ষন করতে পারি (Sakhuja: 2009)।

বাংলাদেশ-চীন বানিজ্যঃ ২০০৯-২০১৩ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	রপ্তানী	আমদানী	বানিজ্য ভারসাম্য
২০০৮-২০০৯	৯৭.০৬	৩৪৫১.৪৭	-৩৩৫৪.৪১
২০০৯-২০১০	১৭৮.৬৩	৩৮১৯.২৮	-৩৬৪০.৬৫
২০১০-২০১১	৩১৯.৬৬	৫৯১২.৫৫	-৫৫৯২.৮৯
২০১১-২০১২	৪০১.৯৪	৬৪৩৩.২১	-৬০৩১.২৭
২০১২-২০১৩	৪৫৮.১২	৬৩২৪	-৫৮৬৫.৮৮

উৎসঃ www.dcci.bd/bilateral/china-bangladesh bilateral trade statistics.

দ্বিপাক্ষিক বানিজ্যের ইতিবাচক উন্নয়ন সত্ত্বেও কিছু প্রতিবন্ধক এরিয়া ও ফ্যাক্টর দু'দেশের মধ্যে বানিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টাকে সর্বপ্রথম চিহ্নিত করা যায় তা হল, দু'দেশের মধ্যে বানিজ্যিক ভারসাম্যের অভাব অর্থাৎ বাংলাদেশ-চীনের মোট দ্বিপাক্ষিক বানিজ্যের ৮৫% ভারসাম্যহীন বানিজ্য (Sarker: 2014)। তবে, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে যেখানে মোট দ্বিপাক্ষিক বানিজ্যের ৯০% ভারসাম্যহীন বানিজ্য ছিল, সম্প্রতি দু'দেশের মধ্যে বানিজ্য ঘাটতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সম্ভবত, বানিজ্য ঘাটতির

অনুপাত হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হল, এশিয়া-প্রশান্ত বানিজ্য চুক্তি বা Asia-Pacific Trade Agreement-APTA'র আওতায় চীনের বাজারে ৫,০০০ বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের অনুমতি প্রদান (Kabir: 2016)। চীনে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চীনের অন্যান্য ব্যবসায়িক অংশীদারদের (ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) চেয়ে অনেক বেশি উপেক্ষিত। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ-চীনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দূরত্ব, বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণের অভাব ইত্যাদি (The Business Standard: 2020)। বর্তমানে চীন বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য লাভের সবচেয়ে আকর্ষনীয় উৎস। দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীনের উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন অঞ্চলগুলোতে (Export Processing Zones-EPZ) বিনিয়োগের প্রতি দিন দিন উৎসাহিত হচ্ছে এবং সম্প্রতি বিভিন্ন অনুপাতে পূর্ন মালিকানা অথবা যৌথ প্রযোজনায় তারা বিনিয়োগ করছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দু'দেশের সরকারের পক্ষ থেকেই তাদের বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন এবং বিদ্যমান বিনিয়োগ চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রতিশ্রুতি পূরনে সম্মত হয়েছে। এক্ষেত্রে, চীনের সরকার এ বিষয়ে সম্মত হয়েছে যে, চীনা উদ্যোক্তাগন বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বানিজ্য ঘাটতি হ্রাসের জন্য সক্রিয়ভাবে সমর্থন দেবে। এছাড়াও, বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পে চাইনিজ উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য চীনের সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে (Parlene: 2013)। বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশে চীনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমান ছিলো ৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল এর আগের দুই বছরের তুলনায় অনেক বেশি। সম্প্রতি, বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতে সবচেয়ে বেশি চাইনিজ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আসছে (Rahman: 2015)।

দক্ষিণ এশিয়ার 'অর্থনৈতিক হাব' হওয়ার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের প্রয়োজন। অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির মতো বাংলাদেশও তার কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা এবং রাষ্ট্র থেকে ঋণ গ্রহণ করে আসছে (Shazzad: 2020)। তবে, বাংলাদেশ সহজেই তার উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে ফান্ড সংগ্রহ করতে পারে এমনটা সত্য নয়। উদাহরণ হিসেবে পদ্মা ব্রীজ নির্মান প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সাহায্য প্রত্যাহারের বিষয়টি তুলে ধরা যায়। যায় ফল হিসেবে, বাংলাদেশ ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্রপতি শি চিন পিংয়ের ঢাকা সফরের ফলে বাংলাদেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে BRI প্রকল্পের অংশীদার হয়েছিলো এবং BRI'এর অধীনে নয়টি ম্যাগা প্রকল্প যার মধ্যে অন্যতম হলো পদ্মা সেতুর সাথে রেল সংযোগ প্রকল্প, কর্নফুলী নদীতে বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মান বাস্তবায়ন হচ্ছে (Rahman: 2021)। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানের পর বাংলাদেশ চীনের BRI প্রকল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঋণ প্রাপক দেশ। এছাড়াও, চীন বাংলাদেশকে তার কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছে। লক্ষনীয় যে, যেখানে পাকিস্তান, শ্রীলংকার মতো দেশ চীনের ঋণ পরিশোধ নিয়ে দূর্বিষহ সময় পার করছে সেখানে বাংলাদেশ ঋণ গ্রহণে তৎপরতা বাড়িয়েছে। ২০১৮ সালে 'United Nations Conference on Trade and Development' (UNCTAD) এর রিপোর্ট অনুসারে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমান ৩৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মাত্র ৬% চীন থেকে নেয়া। বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংক থেকে

সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রহণ করে। তবে, BRI এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যারা চীনের 'ঋণের ফাঁদে' পড়েছে তাদের বৈদেশিক ঋণের অনুপাত নিয়ে বিশ্লেষন করতে গিয়ে কিছু বিশ্লেষক মনে করেন, বাংলাদেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে বৈদেশিক ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে তুলনামুলকভাবে ভালো ব্যবস্থাপনা রাখতে সক্ষম হয়েছে (Deutsche Welle: 2019)। পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দর এবং শ্রীলংকার হাম্বানটোটা বন্দর নির্মানে চীনের ঋণ সাহায্যের (ঋণের ফাঁদ) চিত্র পর্যবেক্ষন করতে গেলে এগুলো বাংলাদেশের জন্য একটি সতর্ক সংকেত। বাংলাদেশে চীনের ফান্ড প্রকল্পগুলো অর্থনৈতিকভাবে অনুকূল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে। এমন কোন ঘটনার নজিন নেই যেখানে বাংলাদেশকে চীনের সকল শর্ত মানতে বাধ্য হয়েছে। তবে, বাংলাদেশের উচিত চীনের সাথে সকল অর্থনৈতিক চুক্তি বিশেষতঃ সফট লোন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হওয়া।

বাংলাদেশ-চীনঃ সামরিক সম্পর্ক

চীন বাংলাদেশের নিরাপত্তা-সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। চীন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর জন্য অস্ত্রের প্রধান সরবরাহকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। Stockhalm International Peace Research Institute'এর একটি রিপোর্ট অনুসারে, বাংলাদেশ তার মোট সামরিক অস্ত্রের প্রায় ৫০% চীন থেকে আমদানী করে, যা ২০১৩ সালে ৭৬% এ পৌছেছে এবং বিগত কয়েক বছর যাবত সামরিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে কয়েক দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (Parvez: 2017)। ২০১০ সালে বাংলাদেশ চীন থেকে ৫টি মেরিটাইম পেট্রোল ভেসেল (MPVs), ২টি রণতরী, ৪৪টি ট্যাংক এবং ১৬টি যুদ্ধ বিমান আমদানি করে (Voice of International Affairs: 2016)। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুবিনের চীন সফরকালে চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিয়াং গোয়াংলির সাথে সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকালে লিয়াং বলেছেন যে, 'China is willing to enchance interactions with Bangladesh in all fields and at all levels at advance bilateral and military relations and make contributions to safeguarding regional peace and stability.' (The Hindu: 2011). অন্যদিকে, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও চীন চারটি দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি করে। এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চীনের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে প্রশিক্ষন ও যন্ত্রপাতি গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী চীন থেকে দুটি 'type 035G-class' (Ming-class) সাবমেরিন ক্রয় করে (Zaman: 2017)। চীনা নৌবাহিনীর ভাসমান হাসপাতাল জাহাজ 'পিস আর্ক' চট্টগ্রাম সফর করে এবং বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করে। বাংলাদেশে চীনের তৎপরতা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা সন্দেহ আছে যে, বাংলাদেশ চীনকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে দিচ্ছে যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত। যার ফলে ভারতের সেনাবাহিনীর এই অঞ্চলে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে (Krishnan: 2010)। অন্যদিকে, পাকিস্তানের গোয়ারদার বন্দর, শ্রীলংকার হাম্বানটোটা বন্দর এবং মিয়ানমারের কিয়কপিউ বন্দর চীনের অর্থায়নে নির্মিত এবং বর্তমানে চীনা কর্তৃত্বে পরিচালিত হওয়ার ফলে ভারত নিজেকে চীন কর্তৃক পরিবেষ্টিত বলে মনে করছে। এছাড়াও, কিছু

কিছু আন্তর্জাতিক মিডিয়া রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে, চীনের BRI প্রকল্প চীনের মিলিটারি বিস্তৃতির একটা ছক। এই প্রকল্প হল চীনের ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল 'String of Pearls' কৌশলের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে। রিপোর্টগুলোতে আরো বলা হয় যে, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মিয়ানমারে পোর্ট নির্মান এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ মূলত এই অঞ্চলে সামরিক আধিপত্য বিস্তৃতির একটি উচ্চমাত্রার পরিকল্পনা (He: 2018)। বাংলাদেশের সামরিক ও কৌশলগত বিষয়ে চীন-ভারতের প্রতিযোগিতা বর্তমান সময়ে চরম আকার ধারন করেছে। প্রবাদ আছে, 'Great Power rivalry makes smaller neighbor vulnerable (Anwar: 2019).' প্রবাদটি চীন-ভারতের আঞ্চলিক প্রভাব বৃদ্ধির দ্বন্দ্বের ফলে বাংলাদেশের অবস্থাকে প্রতিফলিত করে।

চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ফলে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও চীন উভয় দেশের সরকারের মধ্যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন বৃদ্ধির ফলে তা অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরো জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উপসংহার

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Hans J Morgenthau তাঁর 'Politics Among Nations' গ্রন্থে বলেছিলেন, "The character of a foreign policy can be ascertained only through the examination of political acts performed and of the foreseeable consequences of this acts" (Morgenthau: 1967)। বৈশ্বিক নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও পরিবেশের ধরণ (Pattern) পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ২১ শতকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই অসংখ্য ঘটনা ঘটছে এবং নতুন নতুন ইস্যুর সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব ঘটনা বা ইস্যু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছে। অস্থিতিশীল এই বিশ্বে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে তার অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলোকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। একথা সত্য যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনুসারে সম্পদ সীমিত। তাই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে যেকোন দেশের চেয়ে অনেক সজাগ থাকতে হয় এবং নীতি নির্ধারকদের অনেক সীমাবদ্ধতার ভিতর নীতি প্রণয়ন ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে হয়।

অন্যদিকে, ২০০৯-২০১৮ সালের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসর ও সরকার ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। বৈশ্বিক রাজনীতি ও পরিবেশ, অভ্যন্তরীণ সরকার ব্যবস্থা ও সরকারের কার্যক্রম পরিচালনায় নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে, বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমতার রদবদলের সাথে সাথে বৈদেশিক নীতিতেও বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতসহ বিশ্বের গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে ক্ষমতার হাতবদল হলেও বৈদেশিক নীতিতে তেমন হেরফের হয় না বললেই চলে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের শাসনামলে (২০০১-২০০৬) ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকটাই অনমনীয় অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসের উপস্থিতির

সন্দেহে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের মধ্যে এক বৈরী ভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন দ্বান্দ্বিক ইস্যু যথাঃ গঙ্গা ও তিস্তার পানিবন্টন, ট্রানজিট ও ট্রান্সশীপমেন্ট ইস্যু, ছিটমহল বিনিময়, বানিজ্য ঘাটতি, সীমান্ত হত্যা প্রভৃতির সুরাহা নিয়ে পালাক্রমে আলোচনা হয়ে আসলেও বাস্তবে কোনো ফল হয়নি। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের প্রতি ভারতের তৎকালীন সরকারের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। খালেদা জিয়া ও জামায়াতের ভারত সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মনোভাব, পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি, তাদের আদর্শিক অবস্থান এবং ভারতের পক্ষে আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য কোন দলের সরকারের সাথে অন্তরঙ্গভাবে কাজ করার অনীহার ফলে ২০০১-২০০৬ সময়কালে দু'দেশের সম্পর্ক শীতল ও রুটিন মাফিক সম্পর্কের পর্যায়েই থেকে যায়। অন্যদিকে, ২০০৭-০৮ শাসনামলে সেনাবাহিনী সমর্থিত জরুরী অবস্থার সরকারের সময় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক একধরনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যাকে মূলতঃ 'Paradigm Shift' এর প্রাথমিক অবস্থা বলা চলে। কারণ, ওই সময়কার সরকার ভারতের সাথে অনুকূল সম্পর্ক গড়ার যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছে। ২০০৯-২০১৮ সময়কালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের বৈদেশিক নীতিকে অনেকেই ভারতঘেঁষা নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করতে চান। ২০০৭-০৮ শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ভারতের সাথে সম্পর্ক অনুকূল করার যে প্রয়াস ছিলো তা আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নিজের আদর্শ, ঐতিহাসিক কানেকশান, শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ, ভারতের প্রতি ইতিবাচক ও নিঃশর্ত বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কে আস্থা ও ভারতের নীতি নির্ধারকদের আওয়ামী লীগের সাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, ইত্যাদি ফ্যাক্টর ২০০৯-২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে অতি ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কের পর্যায়ে উন্নীত করতে সহায়তা করেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বধীন মহাজোট সরকার (২০০৯-২০১৮) প্রায় সকল ভারতীয় চাহিদাপূরণ ও উদ্বেগ দূরীভূত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও ভারত বাংলাদেশের ভাইটাল কিছু ইস্যুতে ছাড় দেয়নি। আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য কোন দল সরকারে থাকলে ঐ সমস্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা মিইয়ে যেতে পারত।

অর্থনৈতিকভাবে উদীয়মান দেশগুলোকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর বিনিয়োগ ও অনুদানের চাহিদা পূরন করা সম্ভব। বাংলাদেশও এমন সুযোগে সাড়া দিয়ে এসব দেশগুলোকে নিজের উন্নয়নে অংশীদার করতে 'পুবে তাকাও' নীতি গ্রহণ করেছে। তবে, আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে ও ভারতের প্রতি নিজেদের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গীর কারনে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে 'পূর্ব ও দক্ষিণ তথা ভারতমূখী নীতি' গ্রহণ করে। এই সরকারের শাসনামলে ভারতের মতো প্রভাবশালী প্রতিবেশির সাথে অনুকূল সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ার প্রয়াসে লিপ্ত। ভারতকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশীপমেন্ট সুযোগ দান আওয়ামী লীগ সরকারের ভারতমূখী নীতিকে আরো দৃঢ় করে।

বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরে রাখতে সাধারনত ক্ষমতাধর কোন ব্লকে থাকতে চায়। তবে, অর্থনৈতিকভাবে বর্তমান বিশ্বকে যেহেতু 'প্রায় বহুমেরুভিত্তিক'

বলা চলে, তাই নির্দিষ্ট কোন ব্লকের প্রতি ঝুঁকে পড়াটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে বিএনপির সম্পর্কের যে একতরফা বিষয় ছিল, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল তবে, তা অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় বাঁধার সৃষ্টি করে নি। বাংলাদেশের অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অর্থনীতি, নিরাপত্তা এমনকি রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের চেয়ে চীনকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত। চীনের বৈদেশিক নীতিতে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ফলে অনুকূল সম্পর্কই বজায় ছিলো। চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্পে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের সদিচ্ছা এবং এই সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশে চীনের সর্বোচ্চ বিনিয়োগের বিষয় থেকে প্রমানিত হয় যে, চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়টি দলীয় নয় বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক হিসেবে গৃহীত। মূলতঃ বাংলাদেশ একটা মাল্টিপোলার বা বহুমেরুভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ন আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বহুমুখীকরণ (Diversify) করার সচেতন প্রয়াস সুস্পষ্ট। আওয়ামী লীগ শাসিত মহাজোট সরকারের বৈদেশিক নীতিতে যথেষ্ট 'ভারসাম্যপূর্ন' অবস্থা বিরাজমান বলে বিবেচনা করা যায়। বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের মূল 'Concern' বা উদ্বেগ বুঝতে পারার পাশাপাশি সে লক্ষ্যে নিজস্ব এজেন্ডা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সময়োপযোগী বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন এই সরকারের সাফল্য। এছাড়াও, এ সময় সরকার একই সাথে চীন ও ভারতের সাথে যুগপৎ সু-সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

দ্রষ্টব্য

বর্তমান প্রবন্ধটি লেখকের "বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি (২০০১-২০১৮): একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক এম, এস, এস থিসিসের উপর ভিত্তি করে লেখা। থিসিসটি অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া মোঃ মনোয়ার কবীরের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে এম, এস, এস ডিগ্রীর শর্তাংশ হিসাবে লিখিত। লেখক অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া মোঃ মনোয়ার কবীরের মূল্যবান গাইডেন্স ও মতামতের জন্য তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

তথ্যনির্দেশ

Ahmed, Kamal Uddin, 2008, "*Bangladesh and Its Neighbours*", Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, pp. 01-70, 95-112.

Aneja, Urvashi, 2006, "China-Bangladesh Relations: An Emerging Strategic Partnership?", IPCS Special Report 33, *Institute of Peace and Conflict Studies*, New Delhi, India, November, pp. 1-11.

Azad, Abul Kalam, Md. Mahfuz Kabir & Benuka Ferdousi, 2010, "Global Economic Crisis and Its Impact on Bangladesh," ed. Golam Mohammad, *National Security Bangladesh, 2009*, The University Press Limited, Dhaka, pp. 73-74, 81, 93-98.

Baral, Komal Kaushik, 2016, "The Role of Soft Power in India-Bangladesh Relations," Phd. Thesis, Department of International Relations, Sikkim University, Gangtok 737 102, India, December, p. 1.

Baxter, Craig, 1984, "Bangladesh: A New Nation in an Old Setting", Bolder Colorado: Fredric A. Praeger, West-View, pp. 102, 106.

Begum, Anwara (2015), "*Sino-South Asian Relations: Missed Opportunities?*" A H Development House, Dhaka-1205, pp. 359-432.

Bhardwaj, Sanjay, 2006, "India and Bangladesh: Border Issues and Security Perceotions", Farooq Shobhan, ed., *Bangladesh-India Dialogue: Vision of Young Leaders*, University Press Ltd., Dhaka, p. 115-120.

Bhardwaj, Sanjay, 2003, "Bangladesh's Foreign Policy Vis-a-vis India", *Strategic Analysis*, New Delhi, Vol. XXVII, No. 2, April-June.

Bradnock, Robert W., 2006, "Bangladesh and India: The Geopolitics of Cooperation", ed. Farooq Sobhan, *Bangladesh-India Dialogue: Vision of Young Leaders*, University Press Limited, Dhaka, p. 21.

Chakma, Bhumitra, 1996, "Bangladesh-China Relations: Determinants and Interlinkages", (ed.) Abul Kalam, *Bangladesh: Internal Dynamics and External Lingkages*, UPL, Dhaka, p. 257.

Chowdhury, G. W., 1976, "Bangladesh Coup and Counter Coups: International Implications", *ORBIS*, Vol. XIX, No. 4, Winter, p. 1589.

Chowdhury, G. W., 1976, "The Sino-Indian Rift and Its Impact on South Asia and South-east Asia", *South-east Asia Spectrum*, Vol. 4, January-March, p. 14.

Dastidar, Sreyashi, 2006, "Bangladesh-India Trade: Economic and Investment Outlook", ed., Farooq Shobhan, *Bangladesh-India Dialogue: Vision of Young Leaders*, University Press Limited, Dhaka, p. 96.

Datta, Sreeradha, 2008, "Bangladesh's Relations with China and India: A Comparative Study", *Strategic Analysis*, Vol. 32, No. 5, pp. 755-772.

Dixit, Jyotindra Nath, 2003, "*Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh Relations*", Picus Books, Delhi.

Dutta, Piyali, 2010, "India-Bangladesh Relations: Issues, Problems and Recent Development", *Institute of Peace and Conflict Studies*, New Delhi.

Franda, Marcus, 1982, "Bangladesh: The First Decade", South Asian Publishers, Delhi, pp. 11, 241, 280-287.

Habiba, Ummey, 2016, "Continuity and Change in Bangladesh-India Relationship (2001-2015)", *Man and Society; A Journal of North-East Studies*, Vol. XIII, Winter, pp. 135-152.

Haque, Md. Obaidul, 2006, "Foreign Policy Perceptions, Regional and Sub-regional Cooperative Initiatives", Farooq Shobhan, ed., *Bangladesh-India Dialogue: Vision of Young Leaders*, University Press Limited, Dhaka, pp. 25-30.

Hussain, Akmal, 2005, "Bangladesh's New Foreign Policy Direction in Southeast and East Asia: Perspective and Goal", *Journal of International Development and Cooperation*, Vol. 12, No. 1, pp. 1-14.

Islam, Dr. Md. Safiqul, 2020, "A Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor: Geoeconomic and Geostrategic Implications", *International Journal*

of ,Umranic Studies Journal Antrarabangsa Kajian, Umran, Vol 3, Issue 1 | January 2020, available at: http://www.unissa.edu.bn/journal/index.php /ijus /artical/view/133. Page no. 01, 02, 06, 07 and 08.

Kabir, Bhuain Md. Monoar, Mustafizur Rahman Suddiqui, Md. Bakthear Uddin, 2014, "*What Do the Bangladeshi Muslims Think: A Religio-Cultural and Politico-Strategic Study*", A H Development Publishing House, 143, New Market, Dhaka-1205, pp. 25, 26, 54.

Karim, Md. Amirul, 2006, "*Contemporary Security Issues in the Asia-Pacific and Bangladesh*", Academic Press and Publishers Library, Dhaka, pp. 2-5, 25-33, 148-162 & 173.

Karim, Sajid & Mohammad Jasim Uddin, 2016. "Foreign Policy of Bangladesh: Emerging Challenges", *bIISS* Journal, Vol. 37, No. 4, October 2016, Dhaka, pp. 339-340.

Khan, M. Shamsur Rabb, 2009, "Towards Better India-Bangladesh Relations", *Institute for Defence and Analyses (IDSA)*, available at: https://idsa.in /idsastrategiccomments/towards-better-india-bangladesh-relations-2009

Masud, Md. Rezwanul Haque, 2016, "Domestic Inputs in Bangladesh Foreign Policy: A Critical Reappraisal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum),* vol. 61 (2), pp. 259-281.

Mohammad, Golam, 2010, "*National Security Bangladesh, 2009*", University Press Limited, Dhaka, pp. 1-5.

Morgenthau, Hans J., 1967, "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*", Alfred A. Knopf, INC, New York, pp. 4, 25, 76.

Murshid, K A S, 2011, "Transit and Transhipment: Strategic Considerations for Bangladesh and India", *Mumbai: Economic and Political Weekly*, Vol: 46, No: 12 (April 23-29), pp. 43-51, https://www.epw.in.

Pandey, Punam, 2011, "India-Bangladesh Water Relationship: A Renewal of Trust", Research Assistant, USI, India, March 12.

Parlene, Ayesha, 2013, "Importance of the Free Trade Agreement between Bangladesh and China", Bhuina Md. Monoar Kabir, ed., *Sino-South Asian Relations: Continuty and Changes,* Department of Political science, University of Chittagong, pp. 292.

Rahman, M Ashique & Mohammad Jasim Uddin, 2013, "Bangladesh-China Relations: Potentials of Growing Partnership in the Coming Decades and Its Implications", Bhuina Md. Monoar Kabir, ed., *Sino-South Asian Relations: Continuty and Changes*, Department of Political science, University of Chittagong, pp. 158-172.

Rashid, Harun Ur, 2005, "*Bangladesh Foreign Policy: Realities, Priorities, and Challenges*", Academic Press and Publishers Library, Dhaka, pp. 29-46, 71-281.

Rourke, John T., 2005, *International Politics on the World Stage*, The McGraw-Hill Companies, Inc., pp. 3, 36, 42, 48-50 & 57-87.

Sarkar, Noor Mohammand, 2014, "Bangladesh-China Relationship at the Dawn of the Twenty-first Century", Peace and Security Review, Vol. 6, No. 11, First Quarter, pp. 72-73, 78,-81.

Sharma, Sarbjit, 2001, "Us-Bangladesh Relations: A Critique", The University Press Ltd, Dhaka.

Sabur, A. K. M. Abdus, M. Jashim Uddin and Razia Sultana, 2010, "Foerign Policy of Bangladesh: Reflection on Some Crucial Challenges", ed., Golam Mohammad, *National Security Bangladesh, 2009*, The University Press Limited, Dhaka, pp. 9-12, 30-32, 35-37, 45, 49-50.

Sahoo, Pravakar (IEG), 2011, "India Losing Ground to China on Trade with Bangladesh", *East Asia Forum, Economic, Politics and Public Policy in East Asia and The Pacific, Hindu Business Line*, August 20, Avialable at: http://www.eastasiaforum.org.

Sakhuja, Vijay, 2009, "China-Bangladesh Relations and Potential for Regional Tensions", *China Brief: A Journal of Analysis and Information*, The Jamestown Foundation, Vol. ix, Issue, 15, July 23, pp-10-12.

Uddin, Shanjida Shahad and Syeda Tanzia Sultana, 2017, "Bangladesh-India Water Negotiations: Challenges and Way Forward", *bIISS Journal* , vol. 38, No. 2, April, pp. 94, 100-105.

Zaman, Samia and Roksana Islam Sujana, 2017, "Bangladesh-China Relations: From Closer Comprehensive Partnership to Srategic Partnership", *bIISS Journal*, Vol. 38, No. 2, April, pp. 125, 127.

Zeitlin, Arnold, 2005, "Bangladesh's Ambivalent Relations with the PRC", *China Brief: The Jemestown Foundation*, Vol. 5, Issue. 5, March 01.

ডকুমেন্ট, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন

High Commission of India, 2019, Doing Business with Bangladesh, Frequently Asked Questions (FAQs), Bangladesh, Dhaka, p.3, Avialable at: www.hcidhaka.gov.in.

High Commission of India, 2019, Doing Business with Bangladesh, July 3, Avialable at: www.hcidhaka.gov.in.

Anwar, Anu, 2019, "How Bangladesh Is Benefiting From the China-India Rivelry.", The Diplomat, July 12, https:thedimlomat.com.

Banerjee, Manisha, November 1999, A Report on The Impact of Farakka Barrage on The Human Fabric: South Asia Network on Dams, River and People, New Delhi.

Bayes, Abdul, 1999, "Transit and Transhipment", The Daily Star, August, 12.

Daily Star, 2018, Analyst Shows ways to Cut Indo-Bangla Trade Gap, April 10, p. 1.

Deutsche Welle, 2019, Is Bangladesh Falling into a Chinese 'Debt Trap?', July 07, https://www.dw.com.

He, Hongmei, Jiao Nei, Yao Wang, 2018, "China's assistance for Chittagong port Development, not a military conspiracy.", The Daily Star, June 26.

Kibria, Ruksana, 2005, Strategic Implication of Bangladesh-China Relations, Daily Star, February 19, p. 8.

Krishnan, Ananth, 2010, "China offers to develop Chittagong Port.", The Hindu, March 10.

Parvez, Saimum, 2017, China in South Asia: Bangladesh Walks the Tightrope, South Asian Voices, October 03, https:southasianvoices.org.

Rahman, Shaikh Abdur, 2021, The BRI in Bangladesh: 'Win-Win' or a 'Debt Trap?, The Diplomat, November, 09, https:thediplomat.com.

Sazzad, Hussain, 2021, Is Bangladesh at risk of falling into the Chinese debt trap?, The Daily Star, November, 08.

The Hindu, 2011, India-Bangladesh Ties a Model for South Asia, September 6.

Voice of International Affairs, 2016, Bangladesh-China economic military and diplomatic relations, October 20, www.voiceofinternationalaffairsbd.com.

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, ২০১৬, "সুন্দরবন বিনাশী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সকল প্রকল্প বাতিলের দাবিতে জাতীয় জাগরণ কেনো দরকার? : বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প আছে, কিন্তু সুন্দরবনের বিকল্প নেই", ফেব্রুয়ারি ২৯, ওয়েবসাইটঃ https://ncbd.org.

বিদ্যুৎ বিভাগঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭, "রামপাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প", অক্টোবর ১১, অনলাইন উৎসঃ powerdivision.gov.bd.

রামপাল-প্রজেক্ট-বিদ্যুৎ বিভাগঃ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭, বিদ্যুৎ বিভাগ, অক্টোবর ১১, ওয়েবসাইটঃ powerdivision.gov.bd.

আহমেদ, কামাল, ২০১৭, "তৃষ্ণা মিটিল না বাংলাদেশের", প্রথম আলো, এপ্রিল ৯, পৃ. ১১।

ইসলাম, উদিসা, ২০১৮, "সীমান্ত হত্যাঃ প্রতিশ্রুতি অনেক, বাস্তবতা ভিন্ন", বাংলা ট্রিবিউন, জানুয়ারি ৮, ওয়েবসাইটঃ www.banglatribune.com.

দৈনিক জনকণ্ঠ,২০১৫, "ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ৬ কোটি ডলার বাড়ছে", আগস্ট ০৬।

প্রথম আলো, ২০১৮, "বাংলাদেশ-ভারত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর", মে ১২, পৃ. ১২।

-----, ২০১৭, "প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে তিস্তা চুক্তি না-ও হতে পারে", ফেব্রুয়ারি ১৮, পৃ. ১২।

বিবিসি বাংলা, ২০১৮, "বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তঃ বিএসএফের হাত যে কারনে কমছে বাংলাদেশী হত্যা", জুলাই ১১, ওয়েবসাইটঃ https://www.bbc.com/bengali/news.

-------------২০১৫, "যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিরোধ", নভেম্বর ২৩, ওয়েবসাইটঃ https://www.bbc.com/bangla/news

ভোরের কাগজ, ২০১৭, "২৪ সমঝোতা ১১ চুক্তিঃ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে যেসব চুক্তি ও সমঝোতা' এপ্রিল ১৩।

যুগান্তর, ২০১৮, "ভারত-বিএনপির সম্পর্কে পরিবর্তনের হাওয়া", জুন ১১।